BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-II, December 2022
Pp. 43-52

বাংলা কবিতায় গৃহ : একটি দ্বিমুখী উপস্থাপন

সুদক্ষিণা বসু

সুদক্ষিণা বসু
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (স্বশাসিত)
কলকাতা, ভারত
e-mail: sudakshina.ju@gmail.com

সারসংক্ষেপ

সভ্যতার প্রাথমিক পর্ব থেকেই মানুষ যখন ঘর বেঁধেছে আর তাকে কেন্দ্র করে সম্পর্কের ভিত্তিতে তৈরি করেছে সংসার নামের এক বিমূর্ত ধারণা, তখন থেকেই গৃহ ও সংসারের কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়েছে নারীকে। সেই গৃহকেন্দ্রিক ভূমিকাকে মহিমান্বিত করেছে সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি। আর পুরুষের হাতে রচিত সাহিত্যে গৃহ ও গৃহলক্ষ্মী, প্রায়ই এক হয়ে গেছেন আশ্রয়বোধের ধারণায়। একজন মেয়ে ঘরসংসার সামলাবেন, পুরুষ সদস্যকে আশ্রয় দেবেন এটি বাঙালি জীবনে এতই অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেছে যে লিঙ্গসাম্যের যুগেও নারীর গৃহকেন্দ্রিক অবস্থানের বাধ্যতা এবং সেই ভূমিকার মহিমাকীর্তনে যে একটি ফাঁকি আছে, সেটা চট করে চোখে পড়ে না। বাংলা গীতিকবিতার ধারায় একদম সূচনা থেকেই পুরুষ বাচনে এমনই একটি গৃহের ছবি দেখতে পেলেও স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে রচিত বাংলা কবিতার ধারায় নারীর অস্বস্তি এবং জেহাদ ধরা পড়েছে নানাভাবে। কবিতা সিংহ থেকে চন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় গৃহের এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও নিরাশ্রয়ের আর্তি ধরা পড়ে নানাভাবে।

মূলশব্দ

গৃহ, নারী, স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কবিতা, নারীর কবিতা, লিঙ্গসাম্য

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই প্রবন্ধে আমরা দেখাতে চাইব বাংলা আত্মগত কবিতার ধারায় গৃহ নামক ধারণাটি কীভাবে এর দুই আবাসিকের চোখে ভিন্ন রকম অনুভূতিতে ধরা দেয়। পুরুষ-বাচনে গৃহ এক আশ্রয়ের আধার, যেখানে সেবা ও শুশ্রূষা নিয়ে থাকে নারী, গৃহস্থাপনের মূল ভিত্তি সে নারী হলেও সে মূলত সার্ভিস প্রোভাইডার। রবীন্দ্রনাথ থেকে জীবনানন্দ দাশ হয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে রচিত বাংলা কবিতার ধারায় আমরা তারই অনুবর্তন দেখেছি। আমাদের মূল অভিনিবেশ এই নারী-বাড়ি প্রকল্পের প্রতি নারীর প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণে। তাই পাঁচের দশকের কবিতা সিংহ থেকে শুরু করে আট ও নয়ের দশক পর্যন্ত মেয়েরা তাঁদের কবিতায় কীভাবে উপস্থাপন

করছেন এই গৃহ প্রসঙ্গ- সে বিষয়টিই আমরা খুঁজে দেখতে চাইব।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে আলোচিত এই প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমির বানান বিধি অনুসৃত হয়েছে। প্রাথমিক সূত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে কবিতার পঙক্তি।

ভূমিকা

মানুষ মানুষের কাছে আশ্রয় পাবে-এর মধ্যে আপত্তির কী? না, সত্যিই আপত্তির কিছু নেই, না আশ্রয় প্রার্থনার না আশ্রয় দানের। কিন্তু নারীকে গৃহলক্ষ্মী বানানোয় যে একটি ফাঁদ পাতা থাকে, সেটিই আমাদের অস্বস্তির কারণ। আমরা যখন কোনো ব্যক্তির আশ্রয়দাত্রী রূপটির মহিমা প্রতিষ্ঠা করি তখন সেই আলোকছটায় তার অন্য অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়। তখন তাকে কেবলই আমার প্রয়োজনের নিরিখে দেখি-তাকে বিষয়ীকৃত করি বা Objectify করে দেখি। ফলে আশ্রয়দাত্রী তখন শুধুই বুকভরা স্নেহ ও প্রেম নিয়ে আমারই জন্য অস্তিত্ববান, তার অন্যতর আর কোনো চাহিদা, খিদে, ঘুম, স্বপ্ন, জিঘাংসা নেই। তাকে যে মা, কন্যা, প্রিয়া বা স্ত্রী প্রকল্পে দেখা হচ্ছে সেই প্রকল্পবিরোধী সমস্ত অনুভূতিকেই অস্বীকার করা হয়। আমাদের আপত্তি আশ্রয়দাত্রী নারীর খোপে নারীর পূর্ণরূপকে অস্বীকার করায়। কারণ, তা শুধু যিনি দেখছেন তাঁর চোখেই নয়, ওই মহিমান্বিত করে তোলা মেয়েটির চোখেও তার সত্যস্বরূপকে মুছে দেওয়া হয়। সেও তখন বিশ্বাস করে সেই মহান ধাপ্পায় - 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে' অথবা 'কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনো নয়'।

বিশ্লেষণ

সাহিত্যে, পুরুষ বাচনে–

এ নির্মাণ তো এক সামাজিক প্রক্রিয়া। বাংলা কবিতায় আমরা একটু তার চরিত্রটিকে বোঝার চেষ্টা করি বরং। তবে আগে থাকতে নিজপক্ষে একটা, যদিও অকিঞ্চিৎকর, তবুও সাফাই গেয়ে রাখা দরকার। আমরা এটা বিশ্বাস করি না যে, নারী এবং পুরুষ দুটি বিপরীত যুগ্মক বা বাইনারি অপোজিট, যাদের অবস্থান কেবল বৈপরীত্যে। আর দ্বিতীয়ত, পুরুষ এবং নারী শব্দদুটি দুটি সামাজিক নির্মাণকে বোঝাচ্ছে, শরীরচিহ্নে নারী ও পুরুষকে নয়।

'ওগগরা ভত্তা/ রম্ভআ পত্তা/ গাইক ঘিত্তা/ দুগ্ধ সজুত্তা...' এইভাবে পাতা পেড়ে সাজানো সুখাদ্যের একপ্রান্তে আছেন পরিবেশক স্ত্রী, অন্যপ্রান্তে উপভোক্তা পুণ্যবান স্বামী। আমরা 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' এর 'পুণ্যবান'কে পেয়েছি। মধ্যযুগের দেবী অন্নদা বিরুদ্ধাচারী ব্যাসকেও স্বহস্তে পরিবেশন করে খাইয়েছেন। বাংলা কাব্যের আত্মগত ধারাটির সূত্রপাত যে কবির হাতে সে বিহারীলাল চক্রবর্তীকেও দেখি কাব্যলক্ষ্মীকেই গৃহলক্ষ্মীরূপে বন্দনা করতে। পুরুষ 'করম ভূমিতে' খেটে মরে তারপর বাড়ি এলে স্ত্রী সামনে এনে রাখে ফল-জল, স্নেহপূর্ণ নয়নের আশ্রয়। এমনকী সন্তান, পরিবারের বৃদ্ধদেরও সে শুশ্রূষাকারিণী। রোগে সে বৈদ্যবিশেষ।

"রোগীর আগার, বিষাদে আঁধার,
বিকার বিহ্বল রোগীর কাছে
পাখাখানি হাতে করি অনিবার,
দয়াময়ী দেবী বসিয়ে আছে।"[১]

বাংলা গীতিকবিতার প্রথম পর্যায়ে যে পরিবারকেন্দ্রিক বা গৃহকেন্দ্রিক কবিতার ধারা, সেখানেও দেবেন্দ্রনাথ সেনকে দেখেছি গৃহলক্ষ্মীর বন্দনা করতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গানে তাকেই উদ্দেশ করে বলেন– "বিরল তোমার ভবনখানি পুষ্পকাননমাঝে/ হে কল্যাণী নিত্য আছ আপন গৃহকাজে"। তার 'শীতবসন্ত', 'জরা যৌবন' নেই, সর্ব ঋতু ও কালভেদে তার সিংহাসন অচলপ্রতিষ্ঠা। "নিবে নাকো প্রদীপ তব/ পুষ্প তোমার নিত্য নব/ অচলা শ্রী তোমায় ঘেরি/ চির বিরাজ করে"[২] ।

এই প্রায় জ্যোতির্ময়ী অচলাশ্রী কল্যাণীর উপযুক্ত ক্ষেত্র কাঁকননাড়া, শিশুকলরব মুখরিত 'গৃহকাজ'। অতিদ্রুত সময় একটু পেরিয়ে এই বীজবপন কি বৃক্ষশোভা ধরল যদি দেখি, তাহলে পাবো রবীন্দ্রযুগাবসানকারী বিংশশতকের প্রথমার্ধের কবি জীবনানন্দ দাশকে।

কল্যাণী নারী তার 'প্রীতি'ধর্মে 'পান্থজন'কে 'গৃহের পানে' টেনে আনে। জীবনানন্দের কবিতায় তেমনি এক ইতিহাসের পাতায় পাতায় ভ্রাম্যমান ক্লান্ত এক নাবিককে দেখি যে বনলতা সেনের চোখ দুটিতে আশ্রয় পায়। দু'দণ্ড শান্তি দেওয়া নাটোরের সেই বনলতা সেনের চোখের উপমানটি বাংলা সাহিত্যে কিংবদন্তি হয়ে গেছে। 'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন'।[৩] পাখির নীড়, ক্ষুদ্র হলেও তা গৃহ, আশ্রয়। নারীর চোখ, ভ্রামক কবির কাছে তা গৃহের বিকল্প হয়ে উঠেছে। একবার কি খুঁজে দেখব এই নীড়ধারণ করে কবিকে আশ্রয় দেওয়া ছাড়া বনলতার অন্য কোনো পরিচয় পাচ্ছি কিনা-নাকি সবিতা, সুরঞ্জনা, সুদর্শনা, শ্যামলী এরা পুরুষের রক্তে জিগীষাজাগানো এবং জিগীষাক্লান্ত পুরুষকে আশ্রয় দেওয়া ছাড়া অন্য আর কোনো পরিচয় ধারণ করছে?

নারীকেই ঘর বানিয়ে তোলার আর এক উদাহরণ পাব বিংশ শতকের পাঁচ দশকের কবি প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কবিতায়। 'বাড়ির বিষয়ে/ আমি খুব কম জানি'– এমন স্বীকারোক্তির পরেও, যিনি তাঁর কবিতায় ক্রমাগত আশ্রয়সন্ধান করে গেছেন। 'বাড়ির বিষয়ে' নামক ওই একই কবিতায় কোনো এক বিশেষ 'তুমি'কে সম্বোধন করে কবিতার 'আমি' বলছেন–

"তুমি যদি নবজায়মান
গৃহপ্রবেশের মতো পত্রালি সাজাও
তুমি যদি সন্নত আঁখির
কোন দোর মেলে ধর
তাহলে, আবার হয়ত থেকে যেতে পারি।"

অথবা বলছেন–

'আমার নিজের কোনো বাড়ি নেই, /এক যদি তোমার ভেতর গিয়ে/ ঘর নিতে পারি'।[৪]

বিশেষ শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই হোক অথবা সংস্কৃতির উত্তরাধিকারসূত্রেই হোক, নারী এখানে স্বয়ং গৃহ। তার ভেতর ঢুকে পড়লেই আশ্রয়, নিরাপত্তা। তার সন্নত চোখের দরজা খুলে দেবার অপেক্ষামাত্র। 'বাড়ি' আর 'নারী'র একীকরণের আর দুটিমাত্র উদাহরণ দিয়ে আমরা প্রসঙ্গান্তরে যাব।

বাংলাদেশের অন্যতম আলোচিত কবি নির্মলেন্দু গুণ। তাঁর বহুখ্যাত কবিতা 'তোমার চোখ এতো লাল কেন'। 'বাইরে থেকে দরজা খুলতে খুলতে ক্লান্ত' কবিতার 'আমি' চান শুধু একজন কেউ থাকুক ঘরের ভিতরে, যে ভেতর থেকে দরজা খুলে দেবে। দরজা খুলে দেবার জন্য ঘরের ভিতরে থাকা এই নারীকে তিনি অনেকরকম গৃহকর্ম, যেমন, হাতপাখা দিয়ে বাতাস করা, এঁটোবাসন, গেঞ্জি ও রুমাল ধুয়ে নেওয়া ইত্যাদি থেকে এমনকী ভালোবাসার কর্তব্য থেকেও অব্যাহতি দিয়েছেন। তাঁর শুধু যাচঞা - খাবার সময় থালার পাশে বসে তার কবিকে নুন, জল বা পাটশাকভাজার সঙ্গে 'তেলে ভাজা শুকনো মরিচ' লাগবে কিনা জিজ্ঞাসা করা। ভেতর থেকে দরজা খুলে দেবার জন্য ঘরের ভিতরে কবির ফেরার প্রতীক্ষা করা। আর তাঁর চোখ এত লাল কেন– সহানুভূতিসূচক সেই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা।

সত্তরের অন্যতম কবি মৃদুল দাশগুপ্তের একটি পরিচিত কবিতা 'বিবাহপ্রস্তাব'।

> "বাড়িটি থাকবে নদীর কিনারে, চৌকো,
> থাকবে শ্যাওলা রাঙানো একটি নৌকো
> ফিরে এসে খুব আলতো ডাকব, বউ কই
> ...রাজি?"[৫]

এখানেও বাইরে থেকে ফিরে আসবেন কবিতার 'আমি' তার মৃদুমধুর ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য চৌকো বাড়িতে নারীকে অপেক্ষমান থাকতে হবে। এই প্রস্তাবে সম্মতির পরিণতি বিবাহ, গৃহ, পুরুষ কবিতার আমির 'বউ' এর কাছে আশ্রয়প্রাপ্তি।

গৃহের সঙ্গে শুধু 'বউ' বা প্রেমিকার মূর্তিরই যে একীকরণ ঘটেছে– তা নয়। গৃহের অন্যতম আশ্রয় 'মা'ও। তাকে একবার দেখে নিই ঝাঁকিদর্শনের মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুইবিঘা জমি' কবিতার 'উপেন'কে মনে আছে? সমস্ত তীর্থদর্শনেও অতৃপ্ত সে যখন তার স্বত্ব ত্যাগ করা দুই বিঘা জমির কাছে ফিরে আসে, ফিরে আসে জন্মভূমির কাছে, সে দেখে, "বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে/ মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।"[৬]

বঙ্গের বধূ মানেই সে স্নেহ প্রেম আশ্রয়ের আকর। তার একমাত্র পরিচয় ওই আশ্রয়দাত্রীরূপেই। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বঙ্গইতিহাস' গ্রন্থে গীতা চট্টোপাধ্যায় এই বুকভরা মধুর একান্ত পরিচয়ে বঙ্গবঁধুকে দেখার পূর্ণচ্ছেদ ঘটিয়েছিলেন। 'লেডিজ ট্রামের সকাল-বিকাল' কবিতায় দেহবিক্রি করা মেয়েদের শরীর বিক্রি, চালউলি মেয়েদের চুলোচুলি-র দৃশ্যে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন–

"এসব বিখ্যাত দৃশ্য দেখার পরেও ছিল কলকাতার আরো এক দেখা
গরুবেচা গঞ্জহাট ইস্টিশানে ক্ষুধাবন্দী উদ্বাস্তু মেয়ের স্বাস্থ্যফিরি ।
চালউলির দ্বন্দ্বদৃশ্যে এ-বাঙলার বধূদের 'বুকে মধু' ইত্যাদি বিরতি।"[৭]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ও অজস্র ছোট গল্প জুড়ে কীভাবে এই আশ্রয়দাত্রী মহিলা এবং অনেক ক্ষেত্রে তাকে না জানিয়ে চলে যাওয়া স্নেহের ভিখারি পুরুষটির উদাহরণ আছে[৮], সে আলোচনা পৃথক প্রবন্ধের বিষয়।

এই ছিল পুরুষের বাচনে নির্মিত গৃহের বিকল্প নারীর আশ্রয়দাত্রী, স্নেহের আকর রূপটির নির্মাণের অতি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ। একটির প্রত্যুত্তর নারীর তরফ থেকে আমরা পেয়েছি। পূর্বোক্ত, গীতা চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়। এবার আমরা দেখব, গৃহের সঙ্গে নারীর এই অভেদায়নকে নারী কিভাবে দেখেছে। ঘর আলো করে, গৃহলক্ষী সেজে, হাতের কাঁকনের খোঁচা, মুকুটের ভার আর সিঁদুরের কুটকুট কেমন করে সে সহ্য করেছে, মন দেব সে উপাখ্যান সন্ধানে।

ও হ্যাঁ, একজন পুরুষ কবি কিন্তু নারীকে এই মধুময় অস্তিত্বের বাইরে এক বালতি জলের জন্য কলহমুখর হতে দেখেছিলেন। ইঞ্জিনিয়ার হয়ে সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে তাঁর চোখে পড়েছিল–

"...আর বাঙলার বধূ– তাদের দেখলাম জেলাবোর্ডের দেওয়া ইঁদারার পাশে জমায়েত হতে। গ্রীষ্মের দারুণ দুপুরে উন্মুক্ত প্রান্তরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে। আর এই নদীমাতৃক বাংলার বধূদের দেখলাম এক কলসি জলের জন্য পরস্পর বাক্য-গরল বর্ষণ করতে। উপায় নেই তাদের। হয়তো স্বামীপুত্র ম্যালেরিয়ায় ধুঁকছে, উনুনে বার্লি ফুটে যাচ্ছে।"[৯]

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কথা মেয়েদের পক্ষ থেকে উল্লেখ না করলে পাপ হবে যে!

চাঁদের ওপিঠে, মেয়েদের বাচনে

গৃহলক্ষীর এই খোপে মেয়েরা কীভাবে থাকছেন বা গৃহ-নারী সমীকরণের কোনো প্রত্যুত্তর নারীর কবিতায় তৈরি হচ্ছে কিনা এবার আমরা সে বিষয়টি খুঁজে দেখার চেষ্টা করব।

নারীর স্বরায়ণ যাঁর কবিতায় সুস্পষ্ট, সেই কবিতা সিংহকে আমরা দেখেছি সমাজচিহ্নিত ভূমিকার বিরুদ্ধতা করেই নারীর রূপ নির্মাণ করতে। নারীর ঋতুমতী হওয়াকে, বলিরেখা ও চুলের সাদা হওয়াকে তিনি দেখেছেন তার শক্তি হিসাবে। সংসার ও গৃহস্থালি হয়েছে সেই ক্লান্ত কুলুপ যেখানে মাথা রেখে নারী রিফু করেছে সংসার ও সম্পর্ককে। সে বোঝেনি, দুঃখ তাকে এই গণ্ডী থেকে বহুদূরে নিয়ে গিয়ে ফেলবে। 'শেষ দুয়ারের নাম দুঃখ', 'চরিত্রের হীরা', 'ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা হলে' ইত্যাদি কবিতার পাশাপাশি রাখব 'না' কবিতাটিকে। শিল্পে অনুপ্রেরণা হিসাবে নারী ব্যবহৃত হয়ে আসছে অনেকদিন থেকেই। সেই ব্যবহৃত হতে দেওয়ার বিরুদ্ধেই ওই 'না' এর উচ্চারণ।[১০] নারীদেহ সম্ভোগে তৃপ্ত সঙ্গী জানতে পারে না তার দাম্পত্য সঙ্গী বা যৌনসঙ্গীর 'লোনাজল ঝাপসা করে চুপিসাড়ে চোখের ঝিনুক'। 'প্রতিমার মতো' সেই 'নীল মুখ'– অদেখাই থাকে। যে নারীর শরীর ভুক্ত হয়, তা 'কবন্ধদেহ' কারণ, মস্তিষ্কের অস্তিত্ব বাদ দিয়ে পুরুষ উপভোক্তার কাছে নারীর শরীর শুধুই বস্তু। যৌনবস্তু।

সেক্স্যুয়াল অবজেক্ট। মনে পড়ে যাবে না কি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অসুখের ছড়া', 'মেয়েদের জন্যে ভুল ছন্দে' ইত্যাদি কবিতা?[১১] যেখানে অসুস্থতায় নারীকেই মুখ লুকিয়ে ঘুমোনো আশ্রয় জেনেও কবি মনে করেন– "একলা ঘরে শুয়ে রইলে কারুর মুখ মনে পড়েনা/...চিঠি লিখব কোথায়, কোন মুণ্ডহীন নারীর কাছে?"[১২] বা যে রণজিৎ দাশ লিখতে পারেন– "অসুস্থ সঙ্গিনী ফ্রাসোঁয়া জিলো-র গালে জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়ার অপরাধে পিকাসো-র সব ছবি আমি পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দিতে পারি।"[১৩] তিনিই একদা লিখেছিলেন- "রবীন্দ্রসঙ্গীতে ছাড়া আর কোনখানে আছ/ প্রেমের প্রকৃত মুঠি,/ চোখ ও চুম্বন?/ মেয়েমানুষের কাছে? মূর্খ সন্তানের ভার তাদের বইতে হয়, ইহজন্মে তারা/ পুরুষের রৌদ্রছায়া ছুঁতেই পারে না।"[১৪]

সেই মেয়েমানুষের কাটামুণ্ডে এক 'বাসন্তী অসুখ' এর উপস্থিতির কথা বলছেন কবিতা সিংহ। পুরোনো কাঁথার রিফুকাজের মতো ছোটোখাটো গৃহস্থ বঞ্চনা সামলে নিজের চোখের জলকে অবিশ্বাস করে সংসার ধরে রেখেছিল 'শেষ দুয়ারের নাম দুঃখ' কবিতার 'তুমি'।[১৫] দুঃখ তাকে তুষারঝড়ের মতো উড়িয়ে নিয়ে গেছিল সংসার ক্ষেত্র থেকে।

সত্তরের দশক থেকে নারীরচিত কবিতায় গৃহভাবনা একটি পৃথক আলোচনার দাবি করে। গৃহকে কেন্দ্র করে তৃপ্তির কথা বলেছেন অনেক মেয়েই। কিন্তু আমাদের অভিনিবেশ গৃহলক্ষীর খাঁচায় চাপা পড়ে থাকা সেই অসুখী মুখগুলির উদঘাটনে। গোষ্পদ সমান দুএকটি উদাহরণই তাই সীমিত পরিসরে আলোচনা করব।

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতার বইএর নাম *বিজ্ঞাপনের মেয়ে*। প্রকাশকাল ১৯৮৮। আটের দশকে বিজ্ঞাপন ও বিপণনের দুনিয়ায় মডেল হিসেবে যৌন আবেদনসম্পন্ন মেয়েদের উত্থান ঘটেছে। তেমনই হোর্ডিং-শোভিত নিওন-আলো-জ্বলা এক মেয়েকে উৎসর্গ করে বলা *বিজ্ঞাপনের মেয়ে*-র কবিতাগুলি। সেখানে কবি জানান 'ঘরদুয়ারের আড়ালে যে-গল্প একদিন প্রকট হয়ে উঠতে পারতো, তা-ই ফুটে আছে তোমার দিনযাপনে'।[১৬] এই পর্বেই *দেবীপক্ষে লেখা কবিতা* গ্রন্থের 'ঘর'[১৭] কবিতায় দেখি, কপাট খুলে ভিতরে তাকালে, সে দৃশ্যের তাতে চোখ পুড়ে যাওয়ার কথা। একবিংশ শতকে লেখা চৈতালীর কবিতা 'মানবী জার্নাল'। কর্মরত এক মেয়ের বাড়ি ও অফিসে কাটানো সময়গুলি নিয়ে লেখা এ কবিতায় আমরা দেখি, সকাল ছটা বেজে দশ-এ ছেলেকে স্কুলের বাসে তুলে দেওয়া, আটটা পঁচিশে চা এনে স্বামীকে ঘুম ভাঙিয়ে তার লাঞ্চবক্স সাজিয়ে দিয়ে অফিসে পৌঁছানো, অফিসে বসের পায়ে পা ঘষা টিফিন, সন্ধ্যেবেলা পা ব্যথা নিয়ে ফিরতি পথে বাজার এবং নটা বেজে ছয়'এ রাতের খাবারে আমন্ত্রিত স্বামীর বন্ধুকে সঙ্গদান ও রান্না। পৌনে বারোটায় যখন এই সংসার তাকে ছুটি দেয় তখন তার আর কিছু ভাবার অবকাশ থাকে না।

কবিতাটি সম্পূর্ণই উদ্ধৃত করলাম–

" ছটা বেজে দশ।
ও পাশ ফিরল। টিফিন ভরছি, কুইক! কুইক!
বাস এসে গেছে, ছুটতে-ছুটতে, আমিও ছুঁচ্ছি
ছেলের বয়স...

আটটা পঁচিশ।
চার সঙ্গে রোদ এনে ঘরে ওকে জাগিয়েছি। খিদে-খিদে ভাব,
মরুকগে, ওর মিনি লাঞ্চবক্স সাজিয়ে দেব, তো,
আজও ট্রেন মিস...

এগারোটা ষোলো
'ডোন্ট ডিস্টার্ব' বাইরে ঝোলানো। কথা-বলা
শেষ। বস কি চাইছে? অ্যাজ ইউজুয়াল
পায়ে পা ঘষলো...

দুটো দুই। তাই
মিতালী ও আমি। পাতা ওড়াউড়ি। শূন্য তাকাই।
ওটা কোন গাছ, শিমূল? পলাশ? বেট ধরি যদি,
চাইনিজ খাই...

সাতটা তিরিশ।
ঢের কাজ ফিরে। ওর বন্ধুকে ডেকেছে ডিনারে।
আমার জন্য ব্যথা-পা, এবং, রেল বাজারের ঘুমন্ত আলোয়
আষাঢ়ে ইলিশ...

নটা বেজে ছয়।
ও ফেরেনি। তবে, ফিরবে। ক্লান্তি। টেবিল তৈরি।
বিলোল চক্ষে বন্ধুটিকেও গল্প দিচ্ছি। সর্ষের ঝাঁঝ
সারা ঘরময়...

পৌনে বারোটা।
নিজেকে ভাবব? মানে, ওর গায়ে হাত পড়লেও
আলো জ্বললো না, সেই কথা? না কি, বালিশে প্রথম
রক্তের ফোঁটা..." [১৮]

বিংশ শতকের আশির দশক থেকে নারীর কবিতায় ডাইনি, প্রেতিনী, জিনপরি, জলমানুষী, বিজ্ঞাপনের মেয়ে এমনতর চরিত্রের ভিড় আমাদের বুঝিয়ে দেয় ঘরের সম্পর্ককে নারী চ্যালেঞ্জ জানাতে চাইছে। চৈতালির কবিতায় 'আমি' যখনই 'বাড়ি ফিরব' বলে, তখনই প্রেতিনী তাকে ডেকে নেয় লেকের জলে। 'জলমানুষীর ঘর' কবিতায় সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান 'আমাদের রান্নাঘরে অনিচ্ছা জন্মায়'। সংযুক্তা তাঁর প্রথম পর্বের কবিতার বই *অবিদ্যা* (১৯৮৫) তে এক গৃহ কর্মরত নারীর কথা বলছেন যে নতুন ও পুরোনো মশারি ভাঁজ করে রাখতে রাখতে, রান্নাঘর সামলাতে সামলাতে, সোয়েটার বুনতে বুনতে ক্লান্ত। শীতে সে নিজেকেও সোয়েটারের

সুরক্ষা দিতে পারে না। স্ত্রী ভূমিকায় সে তিন ডাইনির খপ্পর থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে দক্ষিণের জানলা, কখনো কখনো নিঃশ্বাসও বন্ধ করে রাখে। এত আপসের পর তার মনে হয়–

"যথেষ্টের একটু বেশি গেরস্থালি এতেও না-পাই যদি
এর চেয়ে আরো বড় উজ্জ্বল মুখোশ কিনতে
এবার তবে কি আমি পুরুলিয়া যাব?" [১৯]

এই ঘর মেয়েটির কাছে তখনই আশ্রয়ের আরাম ও নিরাপত্তার বোধ নিয়ে আসবে যখন হয় ঘরের পুরুষ সদস্যটি কর্মসূত্রে বাইরে, অথবা লেডিস বাস বা লেডিস ট্রেনের কামরায় মেয়েটি সওয়ার। 'এবারের নারীজন্মে' কবিতার পঙক্তি–

'নারীজন্মের এই দুপুর বারোটা/ ডালের সম্বরগন্ধ আর নিরাপত্তা নিয়ে/ ঢুকে পড়ছে মস্তিষ্কের কোটরে কোটরে।' 'লেডিস বাস' কবিতাটি স্মরণীয়। [২০]

গীতা চট্টোপাধ্যায় নারীকে গণ্ডিতে বাঁধার প্রতিবাদ করেছেন কবিতায়। বলেছেন–

'আর তুই পুতুল খেলবি?'
কপালে দিলেন লাল দাগা
'আর তুই চৌকাঠ ছাড়াবি?'
হাতে দেন রাঙ্গারুলি শাঁখা
'ঘাটে গিয়ে দেরি হবে তোর
দুপায়ে আলতার শক্ত ডোর।'[২১]

গৃহ, আসলে নারীকে পুরুষের উত্তরাধিকারীর উৎস হিসাবে দেখে এবং তা তার যৌনতা তথা জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার কল– একথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু গীতা বা চৈতালীর কবিতায় সেই সত্যদর্শনের পরেও থাকে একটা পরিণতি। উপরিউদ্ধৃত কবিতার শেষ পরিণতি পঙক্তি– 'বেদনা আরম্ভ তারপরে/ অন্ধকার শিল্পের ভিতরে', বা 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র প্রবেশক পঙক্তি হিসাবে সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন লেখেন– 'ঐ দেখা যায় বাড়ি আমার'– তখন বুঝতে পারি কবিতা তথা শিল্পই তাঁদের কাছে গৃহের বিকল্প হয়ে উঠছে।[২২]

চন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অঞ্জলি দাশের কবিতাতেও এই গৃহের সীমায় অপূরিতসাধ নারীদের দেখতে পাই। সংসার প্রথমোক্ত কবির কাছে 'প্রেতিনীর সংসার'। যে সংসারের প্রথাই এই যে– 'সকলই বাহিরে আর তালাবন্ধ নিজে।'[২৩] কেন এমনটা হল, এ তাঁর কথাতেই জানতে পারি, যখন, এই সংসারযাত্রার প্রকার কী, তা নিয়ে কবি জিজ্ঞাসিত হন। তাঁর উত্তর ছিল– "শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে মাঝে মাঝেই ছোট ছেলেটিকে নিয়ে আমাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হত, নিশ্চিত কোনো আশ্রয় ছিল না। এমনই একটি দিনে আশালতার সঙ্গে পরিচয় হল, ওর স্বামী ওকে ছেড়ে চলে গিয়েছে, আশালতা বিড়ি বেঁধে সংসার চালায়, ওর পশ্চিম ঢাকুরিয়ার বাড়িতে একরাত আশ্রয় নিয়েছিলাম আমি। গাছ ঝুঁকে পড়েছে, জয়ন্তী গাছ, ঝুরি ঝুরি পাতা, উনুন জ্বেলে রান্না হল, খাওয়া হল। আশালতার বাড়িতে থাকতে কিছু লিখতে পারিনি, বাড়ি ফিরে লিখলাম 'প্রেতিনীর সংসার'।" [২৪]

'অন্য মানুষী' কবিতায় পাই–

"কড়াই ভিতরে তার কী যে আছে দুঃখ কষ্ট ঘৃণা আয়োজন
সম্বরা যখনই দিই তবু আলুনি গেল না এই মনোকষ্টে
নিষিক্ত পাত্রের পাশে লবণের দানি বসে থাকে।"[২৫]

অঞ্জলি দাশের কবিতায় গৃহ ও গৃহকেন্দ্রিক নারীর মিথকে মেনে নিতে গিয়ে কবিতার 'আমি' বলে–

'যেখানে সম্পর্কের গিঁটগুলো ধরা থাকে, সেখানে রোজ মাথা ঠেকিয়ে ভাবি– এই-ই পূর্ণলাবণ্যের জীবন'[২৬] গৃহকে প্রণম্য ভাবতে শেখা মেয়েটি আবিষ্কার করে 'টুপিতে পালকের বদলে টুকরো কাচ গুঁজতে ভালোবাসেন আমাদের স্বামীরা।'[২৭] ফলে যে শয্যা আশ্রয়ের সেখানে দেখি 'গুঁড়ো কাচে ভরে যায় আমাদের... কার্ল অন ম্যাট্রেস' ।[২৮] বিস্ময়ের কথা এই যে, ক্ষুধায় যে কবিতার আমি-কে অন্ন এনে দেয়, সে-ও তার পুরুষসঙ্গীটি নয়, জিনপরিরা। যে জিনপরি কবির স্বজাতি, আত্মপরিচয়ও।

উপসংহার

আগেই স্বীকার করেছিলাম, নারীর কবিতায় গৃহ এক স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ গবেষণার বিষয়। সংক্ষিপ্ত পরিসরে অতিনির্বাচিত উদাহরণ দিয়ে এই আলোচনায় অতৃপ্তিও থেকে গেল অনেক। দেখানো হলো না গৃহের ধারণায় নারীর অন্যান্য আপস, কখনো তার তৃপ্তি, আশ্রয়বোধের অন্যান্য মাত্রাগুলি।

নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম তরঙ্গে নারীকে বহির্জগতে সাম্যের অধিকার দেওয়ার কথা উঠেছিল। এই কর্মক্ষেত্রে এবং বাইরের পৃথিবীতে তাকে আমরা প্রতিষ্ঠিত হতে দেখেছি কিন্তু পরিবারকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থার কেন্দ্র যে গৃহ– সেখানে শ্রমের কোনো সমবন্টন হয়নি এবং বিংশ শতকের শেষ দশকেও গৃহকেন্দ্রিক মিথ এবং অনুশাসন, গৃহকর্মের পাশাপাশি বইতে হয়েছে নারীকে। ফলে ঘরের দিকে আবার নতুন করে তাকাবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পুরুষ, এখন সামাজিক অভিজ্ঞতায় অনেক বেশি 'গৃহকর্মনিপুণ', গৃহকেন্দ্রিক অনুশাসন মানা সতীলক্ষ্মীর ইমেজও আস্তে আস্তে ফিকে হচ্ছে। আর আমরা অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছি একুশ শতকে গৃহকেন্দ্রিক নারী-পুরুষ নতুন সমীকরণে। সে কাব্যালোচনার অবকাশ স্বতন্ত্র পরিসরে হবে নিশ্চয়ই।

তথ্যনির্দেশ

১. বিহারীলাল চক্রবর্তী, '২৫', *বঙ্গসুন্দরী*, কলকাতা, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন কর্তৃক মুদ্রিত, ১২৮৬. https://archive.org দেখেছি-১০.৪.২৩

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কল্যাণী', *ক্ষণিকা* , কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জুলাই ১৯৮০, পৃষ্ঠা- ৯৫০

৩. জীবনানন্দ দাশ, 'বনলতা সেন', *বনলতা সেন*, *জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ* (প্রথম খণ্ড), নতুন মুদ্রণ, কলকাতাঃ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ফাল্গুন ১৪০৬, পৃষ্ঠা-১০

৪. প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, *কবিতাসমগ্র, (প্রথম খণ্ড)*, কলকাতা, প্রমা প্রকাশনী, ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃষ্ঠা-৬৮

৫. মৃদুল দাশগুপ্ত, *নির্বাচিত কবিতা*, কলকাতা, অফবিট প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১৩

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'দুই বিঘা জমি', *চিত্রা*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জুলাই ১৯৮০, পৃষ্ঠা- ৫৯৮

৭. গীতা চট্টোপাধ্যায়, 'লেডিস ট্রামের সকাল-বিকাল', *বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বঙ্গইতিহাস*, কলকাতা, প্রকাশক - বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, জানুয়ারি ১৯৯৩, পৃষ্ঠা- ২৩

৮. *আরণ্যক*-এর ভানুমতী, যে সরলা বনবালাকে, বিকল্প জীবনে বিয়ের যোগ্য মনে হয়েছিল সত্যচরণের, তাকে লবটুলিয়া ছেড়ে চিরতরে চলে আসার আগে জানিয়ে যায় নি সে। 'উপেক্ষিতা' গল্পে স্কুলের চাকরি ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় বিমল বৌদিদির দেখা না পেয়ে দ্বিতীয়বার জানানোর চেষ্টাও করে না। উদাহরণ আরও আছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *আরণ্যক*, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ভাদ্র ১৪২৬

৯. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়, উদ্ধৃত- ['একটি স্মরণীয় দুপুর', অজিত দাশ, 'হোমশিখা', বর্ষ ৩, ফাল্গুন সংখ্যা] , কলকাতা, সুপ্রিম পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪১৭.

১০. কবিতা সিংহ, "না", *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ, ২০২০, পৃষ্ঠা-৭১

১১. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, "মেয়েদের জন্যে ভুল ছন্দে", *আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জুন ১৯৯২, পৃষ্ঠা-৩৬

১২. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪

১৩. রণজিৎ দাশ, 'ক্ষত', *ঈশ্বরের চোখ, শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা. দে'জ পাবলিশিং, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা-১০৭

১৪. রণজিৎ দাশ, 'আর কোনখানে আছে', *আমাদের লাজুক কবিতা, শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮

১৫. কবিতা সিংহ, 'শেষ দুয়ারের নাম দুঃখ', শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, সংশোধিত পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ–জুলাই ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ৪৫

১৬. চৈতালি চট্টোপাধ্যায়, '১৭/বিজ্ঞাপনের মেয়ে', *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, মে, ২০০৬, পৃষ্ঠা -১৭

১৭. তদেব, পৃষ্ঠা-২৯

১৮. চৈতালি চট্টোপাধ্যায়, 'মানবী জার্নাল', *বিষাক্ত রেস্তোরাঁ*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, ২০০৬, পৃষ্ঠা- ৩৮-৩৯,

১৯. সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৫, পৃষ্ঠা-১৪

২০. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৯

২১. গীতা চট্টোপাধ্যায়, 'জন্ম', *বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বঙ্গইতিহাস*, কলকাতা, প্রকাশক–বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, জানুয়ারি ১৯৯৩, পৃষ্ঠা- ৫৮

২২. সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবেশক, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৫

২৩. চন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রেতিনীর সংসার', *ভাসানমঙ্গল*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, ডিসেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা-২১

২৪. সাক্ষাৎকার, চন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিদ্যুৎ কর, বিদুর পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০১৮, পৃষ্ঠা– ৩৪

২৫. চন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ষোলো, অন্যমানুষী', *কবিতাসংগ্রহ*, নদীয়া, আদম, কলকাতা বইমেলা ২০২০, পৃষ্ঠা– ৭৬

২৬. অঞ্জলি দাশ, 'প্রস্তাবের বিরুদ্ধে', *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০০৯, পৃষ্ঠা– ৫৫

২৭. অঞ্জলি দাশ, '১/ পরীর জীবন', *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, তদেব, পৃষ্ঠা- ২৬

২৮. অঞ্জলি দাশ , 'তৃষ্ণা', *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, তদেব, পৃষ্ঠা-৭৩